SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ক্ষমতা প্রসঙ্গে মিশেল ফুকোর দার্শনিক চিন্তা-চেতনা

দীপ সরকার

"সুন্দরের জন্ম দিতে হলে – প্রেম নয়, স্বাধীনতা নয় – অবিনাশী একাকিত্বের ভিতর এক ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে তোমাকে বাঁচতে হবে, মরতে হবে..."। এমন এক সময়, যেখানে আধুনিকতা-নির্মিত এক সুবিশাল কারাগারে নিজেকে বন্দি বলে বুঝতে পারে মানুষ। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলোকেই 'সত্য' বলে ভেবে নিয়ে হয়তো প্রবেশ করে আত্মহননের খেলায়। মিশেল ফুকো বিংশ শতকের সেই চিন্তক, যিনি মার্কস ও ফ্রয়েড-এর পরেই চিন্তন বিশ্বকে সব থেকে বেশি ঘা দিয়েছেন। ক্ষমতা কি? তার প্রকাশ কোথায়, কিভাবে? এইসব প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বোধবুদ্ধি দিয়ে তিনি মানবসভ্যতার পুনর্বিচার করেছেন। তিনি দেখেছেন প্রচলিত চিন্তাভাবনার প্রায় বিপরীতে দাঁড়িয়ে। এভাবেই ফুকো চিহ্নিত করেছেন আমাদের জ্ঞানচর্চার ফাঁক-ফোকর, চ্যুতি-বিচ্যুতি, তার নির্মাণ-অনির্মাণের ব্যাপারগুলোকে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, স্কুল, হাসপাতাল, কারাগার- এগুলো হল ক্ষমতার যন্ত্র এবং ক্ষমতার দাসত্ব অভ্যাস করানোর জায়গা। আইন হল ক্ষমতার একটি হাতিয়ার। ফুকো আমাদের তা মনে করিয়ে দেন, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যা কিছু ব্যতিক্রমধর্মী তা-ই আমাদের চোখে অস্বাভাবিক ও সংশোধনযোগ্য। ফুকোর এই ভিন্ন দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোন, সুগভীর বিশ্লেষণ একালের দর্শন, ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা থেকে শুরু করে বহু বিষয়েই প্রভাব ফেলেছে, বদলে দিয়েছে চিন্তার ধরন, বিচার-বিশ্লেষণের অভিমুখ।

প্রাচীনকালে ক্ষমতার ব্যবহার হতো অমানবিক, নিষ্ঠুর, কারণ লোকচক্ষুর সামনে বিশাল জনসমাবেশে এটাই প্রমাণ করা হতো যে ক্ষমতার মাত্রা কি রকম ভয়ানক হতে পারে। ফুকো এই ধারণা পাল্টানোর জন্য আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত করেছেন হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, কারখানা। এটা কখনো হবে না যে ক্ষমতা প্রয়োগ মানে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ, বরং জনগোষ্ঠীর এক এক অংশের ব্যবহার, প্রবণতা, চাহিদা, স্বার্থ ইত্যাদি যাচাই করে তার মাধ্যমে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। ফুকোর সমস্ত চিন্তা ধারা তার কাজকর্ম সবটাই এমন এক পরিকাঠামোর মধ্যে সাজাতে চেয়েছেন যেটা শুধু ব্যক্তির সার্বিক ভালো, উন্নতির জন্য নয়। অর্থাৎ শারীরিক ভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ না করে মানসিক ভাবে ক্ষমতার যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে মানুষের মধ্যে Social Mobility (সমাজ চৈতন্য)-র বিকাশ ঘটবে। যেটা হবে

ক্ষমতার আদর্শ প্রয়োগ, ক্ষমতার এক বিনির্মাণ। পরে এটাই দেখা হবে যে শারীরিক ভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ না করে মানসিক ভাবে ক্ষমতার যদি প্রয়োগ করানো যায় তাহলে মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি অর্থাৎ সমাজ চৈতন্যের বিকাশ ঘটবে এবং মানুষের মধ্যে সমাজ চৈতন্য বোধ জাগ্রত হবে। উনি আমাদের এটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করছেন যে ক্ষমতার এই বিনির্মাণ বা বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব যখন আমাদের মধ্যে এই ধারণার উদ্ভব হবে যে, ক্ষমতা প্রয়োগ কি জনকল্যাণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভম? কোন সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, যেটা হবে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য। তিনি চেয়েছেন যে কি ভাবে মানুষকে প্রশাসনিকতার অংশ হিসেবে এবং প্রশাসনিক জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে একটা মানবিক ধারণা তৈরি করা যায়, সেই মানবিকতার পথে হাটা যায় কি না বা অগ্রসর হওয়া যায় কি না তা দেখানো। আর এই মানবিক ধ্যান ধারণা শুধুমাত্র পরিলক্ষিত হয় ক্ষমতার এক মাত্রার মধ্য দিয়ে, তাহলো প্রশাসনিকতা (governmentality)। প্রবন্ধের এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে যে, কিভাবে ফুকো সার্বভৌম ক্ষমতার ধ্যান-ধারণাকে পালটে দিয়ে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। প্রশাসনিক জ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে ক্ষমতার বিনির্মাণ বলি বা বিকেন্দ্রীকরণ বলি সম্ভব হচ্ছে তা দেখানো। ফুকো বলেছেন এই ক্ষমতার প্রয়োগ শারীরিক নয়, কোন রকম জোরজবস্তি নয় এই পুরো পরিবর্তনটা আসবে মানসিক স্তরে তথা নৈতিকতার স্তরে। ক্ষমতাকে নিছকই বল প্রয়োগ হিসেবে না দেখে জগতের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক সম্বন্ধ চর্চার আরও প্রত্যক্ষ ও বিস্তৃত পরিসর থেকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ক্ষমতার ধারণা থেকে ফুকোর ক্ষমতার ধারণাটা কতটা ভিন্ন তা নিয়ে দার্শনিক মহলে অনেক মতবিরোধ আছে, কিন্তু ফুকোর চিন্তাভাবনা যে মানুষের নৈতিক ধ্যানধারনার স্তরে ছিল সেই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে পারি না। সাথে সাথে এটাও দেখবো যে আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতার যে রূপ দেখে আমরা অভ্যস্ত, ক্ষমতাকে ফুকো সেভাবে দেখছেন না মোটেই। ফুকোর মতে ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান এই সর্বব্যাপী ক্ষমতা কিভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করে সেটারই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধে।

এই আলোচনার সাথে অতপ্রত ভাবে জড়িত যেটা ফুকো বলছেন যে ক্ষমতা সর্বব্যাপী সেই ভাবনার সাথে জড়িত শাস্তির প্রসঙ্গ, যেটা ফলশ্রুত নয়। প্রশ্ন উঠেছে লোকচক্ষুর আড়ালে কারাগারে অদৃশ্য ভাবে শাস্তি দেওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ কী অপরাধীকে নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি না দেওয়ার নীতি। আরও মানবিক হওয়া কি? আধুনিক শাস্তি ব্যবস্থাকে মানবিক করে তোলা? কারাগার ও মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে আধুনিককালের ধারণা কি এখন অতীতের তুলনায় মানবিক? মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি বা ব্যবহারিক দিকের কি তাহলে মানবিকীকরণ ঘটেছে? উত্তরে ফুকো বলছেন, না। মানবতা নামক কোন মতাদর্শ, মতবাদ বা আগাম তৈরি ধারণা দিয়ে ফুকো বাস্তবতাকে বুঝতে নারাজ। বাস্তবে কি ঘটছে তার বিচার কি ঘটছে তা দেখেই ব্যাখ্যা করতে হবে। ক্ষমতার চর্চা ও শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতির মানবিকীকরণ হয়েছে কথাটা ঠিক না।

প্রকাশ্যে ফাঁসির মঞ্চে নিষ্ঠুর ভাবে ফাঁসি দেওয়া বন্ধ কোন মানবিক কারণে হয়নি, হয়েছে ভিন্ন কারণে। প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড নিষ্ঠুর ভাবে কার্যকর করে সমাজ ও রাজনীতিতে যে ফল পাওয়ার কথা, বাস্তবে ফল হচ্ছিল ভিন্ন। এতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল, ফলে প্রকাশ্যে দণ্ডপ্রাপ্তের মূল উদ্দেশ্যই এতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষমতার সার্বভৌম শক্তি প্রদর্শন, সার্বভৌম রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষীণতম চিন্তাকেও দমন, সমাজে শৃঙ্খলা কায়েম ক্ষমতা চর্চার মধ্য দিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করা।

সামাজিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে এবং মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণ থেকে ক্ষমতার তিনটি পৃথক মাত্রা পাওয়া যায় যথা -

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

সার্বভৌমত্ব হলো সনাতন রাষ্ট্রক্ষমতা যার এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে, যার প্রতিভূ রাজা অথবা আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রপ্রধান। এই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা হয় কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ওপর অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রজামণ্ডলীর ওপর। এই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান প্রকাশ হলো আইন প্রণয়ন করা, সেই আইন প্রয়োগ করা, আইন লঙ্ঘিত হলে লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেওয়া। এই অর্থে সার্বভৌমত্বের আর একটি দিক হলো দন্ড। রাষ্ট্রক্ষমতা বলতে সাধারণভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার কথাই আমাদের মনে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতাতেও সার্বভৌমত্ব রয়েছে, যা ন্যস্ত রয়েছে রাষ্ট্রপতি কিংবা কেন্দ্রীয় পরিষদের উপর। তবে আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতায় শুধু আটকে নেই, আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র কেবল সার্বভৌমত্বের ছকে চলে না, তা চলে অনুশাসনকে অবলম্বন করে।

ফুকো ‘Discipline and Punish’ (অনুশাসন ও দণ্ড) নামক বই এর গোড়ায় অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে এক মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা আছে। যতভাবে পারা যায় আসামীর দেহকে ক্ষতবিক্ষত, খন্ডবিখন্ড করে শাস্তি দেওয়ার সে এক বীভৎস বর্ণনা। সেখানে দন্ডের অর্থ আইন লঙ্ঘনের জবাব হিসেবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা ঘটবে লোকচক্ষুর সামনে বিশাল জনসমাবেশে; যাতে সকলে দেখতে পায় যে রাজার ক্ষমতা কত, তার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করলে কী ভয়ানক শাস্তি পেতে হয় অপরাধীকে। ফুকো বলেছেন এরকম শাস্তি হল অমানবিক, নিষ্ঠুর। ফুকো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই ধরণের দণ্ডব্যবস্থা কিন্তু পরবর্তী শতকে বা কালে বদলে গেল সম্পূর্ণ ভাবে। নতুন সমাজ ভাবনায় বা আধুনিক সমাজ ভাবনায় শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়, দোষীকে সংশোধন করা। সে জন্য দণ্ডও হওয়া উচিত, শারীরিক নির্যাতন নয় দোষীকে নজরবন্দী করে তাকে সামাজিক অনুশাসনে শিক্ষিত করে তোলা।

অনুশাসন (Discipline)

অনুশাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনায় ফুকো আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত করেছেন হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, কারখানা এইসব প্রতিষ্ঠানকে যেখানে মানুষকে রাখা হয় নজরবন্দী অবস্থায়। অসুস্থ মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকর্ম কেমন চলছে তা পরীক্ষার জন্য তাকে নজরবন্দী রাখা হয় হাসপাতলে, আইনভঙ্গকারীকে নজরাধীন রাখা হয় কারাগারে, ছাত্রকে স্কুলে, শ্রমিককে কারখানায়। ফুকোর মতে নজরবন্দী করতে পারলে তবেই তাকে অনুশাসনবদ্ধ করা যায়। এই শাসন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, তা কাজ করে মানুষের চেতনায়। আর এই অনুশাসনের উদ্দেশ্য সার্বভৌম শক্তির ভয় দেখানো নয়, তার উদ্দেশ্য স্ব-শাসন।

আধুনিক সমাজের নাগরিক নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই বুঝে নেবে যে অসুস্থ হলে তার ডাক্তারের নজরাধীন হওয়া উচিত না হলে তার রোগ নিরাময় হবে না। একই যুক্তিতে সে সময় মতো কারখানায় কাজ করতে যাবে, তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবে। এই হল আধুনিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতার আদর্শ সার্বভৌমত্ব নয়, বরং কেন্দ্রহীন সর্বব্যাপী এক অনুশাসনতন্ত্র, যেখানে সকলেই স্বাধীন, অথচ স্বাধীনভাবেই তারা অনুশাসনের শৃঙ্খল পরতে রাজি। আপাত দৃষ্টিতে সার্বভৌম ক্ষমতা এখানে স্ব-শাসনের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে গিয়েছে।

আসলে আধুনিক উদারনৈতিক বা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্ব-শাসিত গণতান্ত্রিক সমাজের যা আদর্শ, ফুকো সেটাকেই ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখানোর চেষ্টা করছেন। হাসপাতালে বা স্কুলে নজরবন্দী হলে আমরা মনে করি না আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হলো। আমরা ভাবি আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের স্বাস্থ্য বা বিদ্যাবুদ্ধির যথাযথ পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন হওয়াই উচিত। আবার যে ডাক্তার বা শিক্ষক আমাদের পরীক্ষা করছেন, তিনিও কোনও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে তা করছেন, এমনটা নয়। তার ওপরেও নজরদারি রয়েছে। তিনিও ঠিক কাজ করছেন কি না তার পরীক্ষা হচ্ছে। এই ভাবে গোটা সমাজের অনুশাসন ব্যবস্থায় কোনও কেন্দ্রবিন্দু নেই যেখানে এসে সব নজরদারি শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে নজরবন্দী। এই হল আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র যার প্রধান অস্ত্র সার্বভৌমত্ব নয়, অনুশাসন। নতুন এই ক্ষমতার জালে বা নতুন এই ক্ষমতার কাঠামোয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্ব-শাসন।

প্রশাসনিকতা (Governmentality)

ক্ষমতার তৃতীয় একটি মাত্রা আছে, যাকে ফুকো নাম দিয়েছেন গভর্নমেন্টালিটি। ফুকো শব্দটি তৈরি করেছেন গভর্নমেন্ট শব্দের অর্থ থেকে এটিকে পৃথক করতে। আমরাও তাই একে শুধু প্রশাসন না বলে বলতে পারি প্রশাসনিকতা। এর মূল কথা হল, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য। কোনও সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, বিশেষ বিশেষ

গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য। যেমন, জনগোষ্ঠীর কোনও বিশেষ অংশের রোজগার বাড়ানোর প্রয়োজন, অন্য কোনও অংশের কর্মসংস্থান দরকার। কোথাও সেচের উন্নতি হলে কর্মসংস্থান বাড়ে, কোনও গোষ্ঠীর জন্মনিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এসব সরকারি নীতি কার্যকর করতে গেলে ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ মানে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ নয়, বরং জনগোষ্ঠীর এক এক অংশের ব্যবহার, প্রবণতা, চাহিদা, স্বার্থ ইত্যাদি যাচাই করে তার মাধ্যমে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিংবা কোনও জনগোষ্ঠীকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বাসস্থান সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গায়ের জোর না খাটিয়ে আর্থিক উৎসাহ দেওয়া বা আর্থিক অন্তরায় সৃষ্টি করা।

ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান অবলম্বন হলো জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রশাসনিক জ্ঞান। ফুকো বলছেন, আধুনিক সমাজে যতই প্রশাসনিকতা বিস্তৃত হয়েছে ততই গড়ে উঠেছে জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের সম্বন্ধে সরকারি তথ্যসংগ্রহ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দৈনন্দিন কাজকর্ম তা সামাজিক হোক বা ব্যক্তিগত হোক, সরকারি হোক অথবা পারিবারিক হোক, শারীরিক হোক আর মানসিক হোক সবই কোন না কোন ভাবে হাসপাতাল, স্কুল, পুরসভা, খাদ্যদপ্তর, অর্থদপ্তর, আদালত, পোস্ট অফিস, থানা, ব্যাংক এবং আরোও সাম্প্রতিককালে সমাজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই বিশাল প্রশাসনিক জ্ঞান ভান্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হচ্ছে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য সমাজনীতি এবং তা কার্যকর করছে শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রই নয়, রাষ্ট্রের বাইরেরও বহু প্রতিষ্ঠান যারা এই ব্যাপক প্রশাসনিকতার অংশ।

সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিদ্যায় ক্ষমতার আলোচনা প্রসঙ্গে মূলত তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। সেগুলি হল – ক্ষমতার উৎস কি? ক্ষমতার প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে? এবং ক্ষমতার প্রয়োগ কি ন্যায়সঙ্গত?

ফুকো বারবার বলেছেন যে, ক্ষমতা বিকিরিত একটি ধারণা, যা সামাজিক সকল সম্পর্কের শিরা-উপশিরায় নিহিত হয়ে আছে। তাই ক্ষমতার অলিন্দে রাষ্ট্রই একমাত্র প্রভাবশালী নয়, ব্যক্তির দিক থেকে পাল্টা প্রতিবাদ আসতেই পারে। বাস্তবিকভাবে বাহ্যিক কোন সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব নেই। ক্ষমতা এই মর্মে অনেকটাই বায়বীয়, অস্থির এক ধারণা, যা প্রতিনিয়ত ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর সমাজ এবং রাষ্ট্রতত্ত্বে ‘ক্ষমতা’ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে এমন কি কিছু তত্ত্ব আছে যা ক্ষমতা বিন্যাসের ধরণ সংক্রান্ত আলোচনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা শুধুই কর্তৃত্ব এবং

ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ফুকোর তত্ত্বকে অন্ধভাবে বা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা নয় মোটেই। ক্ষমতা সব সময়ে একটা অসম সামাজিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। যিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তিনি কখনোই যার ওপরে প্রযুক্ত হয় তার সমকক্ষ নয়। সামাজিক মর্যাদায় তার স্থান সব সময়ে দ্বিতীয়জনের থেকে উঁচুতে। ক্ষমতার প্রয়োগকর্তা ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য ক্ষমতা প্রভাব থেকে তাকে স্পর্শ করে না। ক্ষমতার তিনি প্রয়োগকর্তা এর গ্রহীতা নন। ক্ষমতা সংক্রান্ত আলোচনার সাবেকী ছক প্রয়োগকর্তা এবং গ্রহীতার মধ্যে এক অনিবার্য দ্বিত্বতার প্রতি আমাদের সচেতন করে। অন্যদিকে, ক্ষমতা যার ওপরে প্রযুক্ত হয়, যাকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ক্ষমতার গ্রহীতা বলে উল্লেখ করছি - তিনি কোন ভাবেই কর্তা হতে পারেন না। হতে পারতেন যদি ক্ষমতা তার উপরে প্রযুক্ত না হতো। ক্ষমতা প্রয়োগ তার থেকে সম্ভাব্য কর্তৃত্ব করার অধিকার হরণ করেছে। রাষ্ট্রতত্ত্বের ভাষায় তিনি হলেন অ-কর্তা বা অবজেক্ট।

সমাজে কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা কখনই এইরকম অতি সরলীকৃত দ্বিমাত্রিক পথ ধরে এগোয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়, তা অনেক জটিল আকার ধারণ করেছে। প্রয়োগকর্তার কাছে ক্ষমতা প্রয়োগ করার চেয়েও ঢের বেশি জটিল সমস্যা হল, গ্রহীতার তরফ থেকে প্রতিবাদের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা। কেবল অন্যের ওপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করলেই হল না, এই প্রয়োগকে প্রশ্নহীন ভাবে বা নির্বিবাদে মানিয়ে নেওয়ানো একটা বড় কাজ। আর তা করতে গিয়ে প্রয়োগকর্তাকে গ্রহীতার মনে একটা স্থায়ী আনুগত্যবোধ সঞ্চারিত করতে হয়। এই কাজটা অতি সহজে সম্পন্ন করা যায়, যদি তার মাথায় একটা ভ্রান্ত কর্তৃত্ববোধ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। আদতে তো সে ক্ষমতার গ্রহীতা। অ-কর্তা যদি নিজেকে কর্তা বলে ভাবতে শুরু করে বা ঠিকভাবে বলতে গেলে অ-কর্তার মধ্যে যদি কর্তা হবার আত্মপ্রসাদ সঞ্চারিত করা যায় তাহলে তো আর বাস্তবিক সে কর্তা হয়ে যায় না। কিন্তু বাস্তবে যে কর্তা তার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নও উচ্চারণ করে না। কর্তার কর্তৃত্ব এভাবে সুরক্ষিত হয়।

এখানে যে প্রশ্নটা এসে যায় তা হল, ক্ষমতা প্রয়োগের অসম বিন্যাসকে বাস্তব জীবনে বদলানোর কি তাহলে কোন উপায় নেই? প্রয়োগ কর্তা কি কেবল ক্ষমতা প্রয়োগ করেই যাবেন? আর গ্রহীতা কি কেবল মাথা পেতে তা গ্রহণ করবেন? বা ভ্রান্ত চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়ে মনে মনে সাময়িক আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন? আজকে যারা ক্ষমতার গ্রহীতা কালকে তারাই সমাজ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে প্রয়োগকর্তাতে পর্যবসিত হবেন। আর ঠিক একই ভাবে আজ যারা কর্তা তাদের গ্রহীতার পদে অবনমন অবশ্যম্ভাবী, কর্তা এবং গ্রহীতার পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের ফলে কিন্তু ক্ষমতা বিন্যাসের একান্ত অসম ছকের আদৌ বিলোপ ঘটছে না। ব্রাহ্মণের জায়গায় যদি শূদ্রের কর্তৃত্ব কায়েম হয়, কর্তৃত্বের প্রয়োগ হয়, তবে কর্তৃত্বের প্রয়োগ যে

ঠিক পথে চলতে থাকবে তা বিলোপ হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু সমাজে যারা এতকাল কর্তৃত্ব করে এসেছেন অর্থাৎ যারা এর মাথা তাদের কিন্তু কোন রকম অবনমন ঘটবে না। তা যদি হয় তাহলে সেই সমাজে ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মুশকিলটা হল আমরা সবাই রাজা যদি হই, তাহলে 'রাজার রাজত্ব' বলে আর কিছু থাকে না।

১৯৮০ সালে ডেনিস রঙ একটা বই লেখেন 'পাওয়ার'। সেই বইতে তিনি একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তোলেন, প্রশ্নটা মোটামুটি এইরকম ছিল - এক সান্ধ্য পানভোজনের আসরে কোন এক পুরুষ যখন কোন এক মহিলার দিকে 'ভদ্র দৃষ্টি' নিক্ষেপ করেন এবং তার দ্বারা যদি মহিলার মধ্যে যৌন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তাহলে তাকে কি ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যাবে? লক্ষণীয়, এখানে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা প্রকৃতিগতভাবে 'ভদ্র'। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ফল হল এই যে, সেই মহিলার মধ্যে যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টি করার কোন উদ্দেশ্য বা মতলব ছিল না; তাঁর দৃষ্টি 'ভদ্র' ছিল। রঙ এর মতে, ক্ষমতা প্রয়োগ অত্যন্ত সচেতন প্রক্রিয়া এর মধ্য দিয়ে প্রয়োগকর্তা তার উদ্দেশ্য সাধন করেন, বিশ্বের ওপরে তার কর্তৃত্ব কায়েম করার কাজটা অতি সচেতন কাজ। যেহেতু সচেতনতার প্রাক শর্তটি অনুপস্থিত তাই একে ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। এই উদাহরণে পুরুষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাননি কিন্তু তিনি সমাজের চোখে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফেললেন। ক্ষমতার বীজ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত, প্রয়োগকর্তার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপরে তা নির্ভর করে না।

ব্যাপারটা বোঝাতে ফুকো আলোকবৃত্ত বা প্যান-অপটিকনের উদাহরণ ব্যবহার করেন। আলোকবৃত্তের ধারণাটা তার নিজস্ব নয়, এটা তিনি পেয়েছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের কাছ থেকে। আলোকবৃত্ত এক বিশেষ ধরণের স্থাপত্য। বৃত্তের পরিধি জুড়ে সারিসারি ঘর। ঘর গুলোর অবস্থান এমনই যে একটার সাথে আর একটার কোন সম্পর্ক নেই, মাঝখানে দুর্ভেদ্য দেওয়াল। এক ঘরের লোক পাশের ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা টের পায় না। ঘর গুলো মাঝখানে আটকানো হলে কি হবে প্রত্যেকটাতে বাইরের এবং ভিতরের দিকে জানালা আছে ফলে বাইরের থেকে আলো এসে ঘরের ভেতরটাকে আলোকিত করে। আর বৃত্তের কেন্দ্রে আছে একটা টহলদারি করার মিনার, যেটা শীর্ষ থেকে প্রতিটা ঘরের ভেতর দিককার জানালা দিয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় ভিতরে কি ঘটছে না ঘটছে। বাইরে থেকে আলো আসায় ঘর আলোকিত তাই নজরদারির কোন অসুবিধে নেই এই ধরণের স্থাপত্য সচরাচর জেলখানায় দেখা যায়। এই সম্পর্ক গুলোর একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে - আমার চাওয়া না চাওয়ার ওপরে নির্ভর করে না। উল্টোদিকে কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেহেতু ক্ষমতার বীজ সামাজিক সম্পর্ক গুলোর মধ্যে নিহিত, এই সম্পর্ক গুলোর বিন্যাসকে ক্ষমতার প্রশ্ন থেকে আলাদা করে দেখা

অসম্ভব। যেহেতু সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিকে নিয়েই সামাজিক সম্পর্ক গুলো গড়ে ওঠে, তাই প্রতিটি ব্যক্তি বৃহত্তর অর্থে ক্ষমতার শিকার।

ক্ষমতা বহুধাবিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ক্ষমতার যেমন কোন নির্দিষ্ট গতিপথ নেই, তেমনই নেই কোন উৎসমুখ। ক্ষমতামাত্রই যে তার অভিমুখ কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে ধাবিত হবে তা নয়, তা প্রান্ত থেকেও আসতে পারে। তাই ফুকো ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলেছেন "Power comes from below; that is, there is no binary and all-encompassing opposition between rulers and ruled at the root of power relations and Serving as a general matrix"। সেই কারণে ক্ষমতা সমমাত্রিকও নয়।

ফুকো ক্ষমতা প্রসঙ্গে অভিনব ও প্রবর্তনমূলক মতামত প্রদর্শন করলেও তাঁর দর্শন কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক তাত্ত্বিকদের মধ্যে ক্ষমতা বিষয়ক বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে নানান সমালোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মূলত দুটি ধারার সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম ধারাটি যুক্ত হয়ে আছে আদর্শের সঙ্গে আর দ্বিতীয় ধারাটি যুক্ত হয়ে আছে কর্তৃত্ব ও প্রতিরোধের সম্ভাবনার সঙ্গে। ক্ষমতা ও জ্ঞানকে কখনোই আলাদা করে দেখা সম্ভব না, কারণ জ্ঞান সর্বদা নির্মিত হয় ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে। সেই অর্থে আমরা বলতে পারি যে ক্ষমতা হল এখানে জ্ঞানের জনক। এই ক্ষমতা আর জ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিকতার সম্পর্কটি স্বীকার করার জন্য ফুকোর তত্ত্বের মধ্যে অনেক নেতিবাচক দিক সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন। সেই কারণে ফুকোর তত্ত্ব সামাজিক ক্ষত গুলি থেকে মুক্তির কোন দিশা দেখাতে পারেনি বলে সমালোচকরা তাঁর তত্ত্বকে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন। আবার অনেকেই এমনটাও বলেন যে, যেহেতু ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজ করে এবং ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু নেই এমন বলায় মুক্তি বা স্বাধীনতা অসম্ভব হয়ে যাবে।

ফুকো মনে করেন স্বাধীনতা ক্ষমতার অলিন্দেই বাস করে। কিন্তু স্বাধীনতার আবির্ভাব হয় যখন ক্ষমতার সম্পর্কের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে সামাজিক সমীকরণের প্রবর্তন হয় - যখন তুলাদন্ডে ক্ষমতার সম্পর্কের কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয় তখনই স্বাধীনতার সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি দাবা খেলার প্রসঙ্গটি এনে বলেন প্রতিটি চালে আছে ক্ষমতার সম্পর্কের পালাবদলের সুযোগ, এই প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিবর্তনে রয়েছে। ক্ষমতার পরিবর্তন ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ উভয়ই ব্যক্তি ও সমষ্টি ভিত্তিক হতে পারে। ক্ষমতার পরিবর্তনে আধিপত্যের সমাপ্তি হয় এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও ফুকো সর্বৈব অবদমিত ক্ষমতার চেহারাটিকে বাতিল করেন, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা হলো ক্ষমতার থেকে মুক্তি। মুক্তিকে তিনি একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন কারণ তিনি মনে করতেন যে কোন ক্ষমতার সম্পর্ক এমন কি তা

ঔপনিবেশিক অধ্যুষিতের হলেও মুক্তি অর্থাৎ শোষণের পরিসমাপ্তি সম্ভব। আধিপত্যের সমাপ্তি মানে কিন্তু ক্ষমতার শেষ নয়। বরং এখানেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি ব্যাপ্তি লাভ করে। স্বাধীনতা কোন অন্তিম পর্যায়ও নয়, যাকে উপলব্ধি করতে হবে বরং এটি একটি অভিব্যক্তি যা প্রতিরোধ, পরিবর্তন ও অন্যান্য স্বাধীনতাকে চর্চার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্বে যে যে প্রত্যয় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তাতে সমাজের ক্ষমতার বিন্যাসের এক নিরন্তর নির্মাণ - বিনির্মাণের প্রবাহ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আর যাই থাকুক না কেন, রয়েছে একরাশ সম্ভাবনার ক্ষেত্র। ক্ষমতা মানে ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের কিছু আরোপ মাত্র নয় বরং ব্যক্তিসাপেক্ষিকতার প্রকৃত নির্মাণ - ব্যক্তির সাবজেক্টিভিটি হল ক্ষমতার সৃষ্টি এবং তা একই সঙ্গে এমন কিছু যার দ্বারা ক্ষমতা কার্যকরী হয়। আধুনিকযুগে প্রত্যাবর্তনের পর বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে রাজার প্রভাব নেই মোটেই নয়। তবে ক্ষমতার সেই প্রভাববলয় ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি মোটেই নয়। এখানে আইন-আদালত, রাষ্ট্র, সংবিধান ও কারাগারের রাজার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে, বিনষ্ট হয়নি মোটেই নয়। এখন আর পূর্বের মতো চাবুক মারা হয়না, অগ্নিদহন, গিলেটিন, পাথর নিক্ষেপ, অন্ধকূপে নিক্ষেপ, শূলে বিদ্ধ করা, মাটিতে পুঁতে তিল তিল করে হত্যা করার মতো ঘটনা গুলো ঘটেনা ঠিকই মোটেই নয়। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের জায়মানতা বজায় থাকে কিনা, প্রশ্ন থেকেই যায়। ক্ষমতা মানেই যে নেতিবাচক বা হতাশাজনক হবে তা না, ক্ষমতার একটা উৎপাদনশীল দিক আছে। এরই ইঙ্গিত এই স্থলে ফুকো দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

- প্রদীপ, বসু, *মিশেল ফুকো শেষ পর্যায়ের তত্ত্বভাবনা,* ২০১৯, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- পার্থ, চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* ২০০০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯।
- পার্থ, চট্টোপাধ্যায়, *আমাদের আধুনিকতা,* ১৯৯৪, কলকাতা, একুশে।
- পারভেজ, হোসেন, *মিশেল ফুকো পাঠ ও বিবেচনা,* ২০০৭, সংবেদ।
- চিরঞ্জীব, শূর, *মিশেল ফুকো,* ২০১৬, নভেম্বর, আলোচনা চক্র।
- নির্মল, বন্দ্যোপাধ্যায়, *মিশেল ফুকো ইতিহাস-তত্ত্ব-দর্শন,* ২০১৪, অক্টোবর, কৃষ্টি।
- রমেশচন্দ্র, মুখোপাধ্যায়, *ফুকো,* ২০১৯, তবুও প্রয়াস।
- অমল, বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক,* ২০১৪, জানুয়ারি, এবং মুশায়েরা।
- রতনতনু, ঘোষ, *উত্তরাধুনিক চিন্তাধারা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ,* ২০০৯, ফেব্রুয়ারি, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

- Barry, Smart, *Michel Foucault*, 1985, London, Routledge.
- Calcutta Journal of Political Studies (New Series) Vol. 1, 2001 – 02.
- Michel Foucault, *'Governmentality'*, in Graham Burchell, Colin Gordon and Peter Miller,eds, The Foucault Effect; Studies in Governmentality, 1991, Chicago University Press.
- Michel Foucault, *Dscipline and Punish; The Birth of the Prison*, 1979, tr. By Alan Sheridan, Penguin.
- Mark G. E. Kelly, "Power II", *The Political Philosophy of Michel Foucault*, 2009, London, Routledge.
- Foucault, M. *The Subject and Power*, 1982, Critical Inquiry.